Rajshahi University journal of arts & law Vol. 53 (2025) pp. 41-60
ISSN 2309-0898 (Print), 2408-8773 (Online)
https://doi.org/10.64102/rujal.0720

১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ: আর্থ-সামাজিক সংকট
[The Bengal Famine of 1943: Socio-Economic Crisis]

মর্তুজা খালেদ*

Abstract

The Bengal Famine of 1943 was a devastating man-made disaster that resulted in millions of deaths due to starvation, disease, and social upheaval. Triggered by British colonial policies, World War II disruptions, and a series of natural calamities, the famine disproportionately affected the rural population, particularly agricultural laborers and sharecroppers. The British governmentÕs failure to provide adequate food relief and the hoarding of rice by traders exacerbated the crisis. The famine highlighted the vulnerability of BengalÕs economy, which had been suffering from rapid population growth and inadequate agricultural development. Despite external aid offers, the British administration’s negligence and prioritization of military needs over humanitarian concerns contributed to the severity of the disaster.

Keywords: Bengal famine 1943; Man-made disaster; British colonial policies; Food scarcity.

১৯৪৩ সালে বাংলায় সংঘটিত দুর্ভিক্ষ ছিল এক নির্মম ও হৃদয়বিদারক মানবসৃষ্ট বিপর্যয়, যা ঔপনিবেশিক অপশাসনের এক নিদর্শন হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, দুর্ভিক্ষ চলাকালে বাংলার মানুষের মৃত্যুমিছিল যখন দিন দিন দীর্ঘতর হচ্ছিল, তখন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে আগ্রহ দেখায়নি। খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, অন্য অঞ্চল থেকে খাদ্য সরবরাহ কিংবা বৈদেশিক সাহায্য এসব দিকেও তাদের নির্লিপ্ততা পরিলক্ষিত হয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাসহ কয়েকটি দেশ খাদ্য সহায়তা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল নানা অজুহাত দেখিয়ে সে সহায়তা প্রত্যাখ্যান করেন। ব্রিটিশ শাসনাধীনে বাংলায় সাত বার দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়। দুর্ভিক্ষ হয় ১৭৭০, ১৭৮৩, ১৮৬৬, ১৮৭৩, ১৮৯২, ১৮৯৭ ও শেষে ১৯৪৩-৪৪ সালে। এ দুর্ভিক্ষগুলির মধ্যে ভয়াবহ ছিল ১৭৭০ ও ১৯৪৩-৪৪ সালের দুর্ভিক্ষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর নাৎসী বাহিনীর হাতে যত ইহুদীর মৃত্যু ঘটেছিল তার চাইতে বেশী মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল বাংলার ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে।[১] এই প্রবন্ধে ১৯৪৩ সালের এই দুর্ভিক্ষের পটভূমি, কারণ, প্রশাসনিক অব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া এবং এর প্রভাবসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত

বাংলা সে সময় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না; প্রতি বছর কিছু পরিমাণ খাদ্যশস্য বাইরের উৎস থেকে আমদানি করতে হতো। এই আমদানির প্রধান উৎস ছিল বার্মা, যেখান থেকে বার্ষিক গড়ে প্রায় ২৩ লক্ষ টন চাল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য বাংলায় প্রবেশ করত। কিন্তু ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে বার্মা জাপানের দখলে চলে গেলে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে দুটো বড় ধরনের সংকট সৃষ্টি হয়– প্রথমত, বার্মায় বসবাসরত বিপুলসংখ্যক বাঙালি নিরাপত্তার অভাবে স্বদেশে ফিরতে শুরু করে, যার ফলে জনসংখ্যার চাপ বাড়ে; দ্বিতীয়ত, ১৯৪২ সালের জুন মাসে চট্টগ্রামে জাপানি বিমান হামলার পর থেকে বার্মার সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য কার্যত বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে বাংলার প্রধান খাদ্য আমদানির পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে পড়ে।[২]

---

* প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, বাংলাদেশ; ই-মেইল: mortuzakhaled@yahoo.com

১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাসে চালের বাজারে অস্থিরতা ও অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। অথচ বছরের এ সময়ে চাষির ধানের গোলা পূর্ণ থাকে আর অল্প কিছু মানুষই বাজারে আসে খাদ্যশস্য কিনতে। কিন্তু তারপরও হু-হু করে চালের দাম বেড়ে চলে। ১৯৪৩ সালের মে মাসের শেষে তা লাফিয়ে এমন এক অঙ্কে পৌঁছে যায় যা স্বাভাবিক দামের চেয়ে চার থেকে ছয়শ শতাংশ বেশি। চট্টগ্রামে চালের দাম প্রায় আট-শো শতাংশ বৃদ্ধি পায়। চালের এই আকাশছোঁয়া দাম সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের ভারসাম্যকে নিমেষে তছনছ করে দেয়। খাদ্যাভাবে পীড়িত মানুষ প্রথমে গয়নাগাঁটি বিক্রি করে অথবা বন্ধক রেখে মহাজনের কাছ থেকে চাল কেনার টাকা ধার করে। তারপর গৃহপালিত পশু ও বাসন-পত্র বিক্রি করে। এরপর বাড়িঘরের দরজা-জানালা খুলে বিক্রি করে। সবার শেষে চাষের যন্ত্রপাতিও বিক্রি করতে বাধ্য হয়। অসহায় মানুষ যখন সবকিছু হারিয়ে গেল, তখন তারা বন্য শিকড়, ফল এবং পাতার উপর নির্ভর করে বাঁচতে চেষ্টা করে। বন্য কোলোকেসিয়া, পুকুরের শাপলা গাছ, কন্দ, গুগলি, শামুক সব কিছুই খেয়ে ফেলে মানুষ। চাষবাস শেষ। আশপাশের বুনো জংলি ঘাস-পাতা ফলমূলও শেষ। এরপর গ্রাম ছেড়ে দলে দলে খাদ্যের সন্ধানে শহরের পথে রওনা দেয়। ততদিনে তাদের স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি হারিয়ে যায়। খাবারের অভাব তাদের দুর্বল করে, অস্বাস্থ্যকর খাবার তাদের হজমশক্তিকে বিপর্যস্ত করে যার ফলে বেশিরভাগ মানুষ পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়। এটি ছিল বেশিরভাগ বয়স্ক পুরুষ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে কারণ তারা শিশুদের ক্ষুধা থেকে বাঁচানোর জন্য তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের এ আত্মত্যাগ কোনো কাজে আসেনি। জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে কলকাতা শহরের পথে পথে হাজার হাজার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মিছিল দেখা যায়, শোনা যায় তাদের কাতর আর্তনাদ, "ফ্যান দাও গো, ফ্যান দাও'।[৩] এ সময় কোলকাতায় আসা ক্ষুধার্ত মানুষ খাবার নয় ভাতের ফ্যান খেয়ে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করেছিল।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সমকালীন অবস্থা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক তারকচন্দ্র দাস, তার ভাষায়, "যখনই লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে হাঁটতম তখন ধর্মতলা স্ট্রিট এবং শিয়ালদহ স্টেশনের মাঝামাঝি পূর্ব দিকের ফুটপাতগুলির উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পরিবারগুলির উপর থেকে চোখ সরাতে পারতাম না। এরাই দুর্ভিক্ষের আসল শিকার। এই রকম একটি পরিবারের ঘটনা বর্ণনা করা যাক।"[৪]

> একটি বড়ো গাছের নীচে ওরা আশ্রয় নিয়েছিল। পরিবারের সদস্য স্বামী, স্ত্রী ও তাদের তিনটি সন্তান। যেদিন আমি এদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করছিলাম সেদিন স্বামী অসুস্থ এবং তার স্ত্রী তিনখানি ইঁটের সাহায্যে একটি উনুন বানিয়ে মাটির হাঁড়িতে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা কিছু তরিতরকারির খোসা সেদ্ধ করছিল। ওদের তিনটি সন্তানের পোড়া কাঠের মতো চামড়ার রং। ওরা কাছেই ফুটপাতের উপর শুয়েছিল। ওদের বাবার কঙ্কালসার দেহের খাঁচা দেখে বোঝা যাচ্ছিল একসময় মানুষটির দেহে মজবুত মাংশপেশি ছিল। আজ সেগুলি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সারা মুখময় দাঁড়ি, চোখদুটি কোটরে বসে গেছে।... দশ ফিট দূর থেকেই মহিলাটির বুকের প্রতিটি পাঁজর গোনা যায়। ওর বয়স পঁচিশ বছরের বেশি নয়, অথচ মহিলাসুলভ কোন লক্ষণই ওর দেহে আর অবশিষ্ট নেই। শনের নুড়ির মতো চুলের প্রতি কতকাল নজর দিতে পারেনি কে জানে। ওরও চোখদুটি কোটরের গভীরে চলে গেছে কিন্তু স্বামীর মতো প্রাণহীন নয়। বরং ওর চোখদুটিতে রয়েছে এক অসাধারণ দীপ্তি। জ্বল জ্বল চোখদুটি সম্ভত এই ভয়ংকর দুর্যোগেও সন্তান তিনটি বাঁচিয়ে রাখার প্রতিজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ। কারণ ও জানে ওর স্বামীকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। একটি মেয়ের পা ফুলে রস গড়াচ্ছে। চারদিকে মাছি উড়ছে। কিন্তু তিনটি সন্তান অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে মাটির হাঁড়ির ফুটন্ত তরকারির খোসাগুলির দিকে। এরকম দৃশ্য কোলকাতার রাস্তায় তখন প্রতিনিয়তই দেখা যেত।
>
> স্বামী, স্ত্রী এবং দুই সন্তানের এক পরিবার। এরা স্থানীয় একটি লঙ্গরখানা থেকে খাবার পেত এবং বাড়িবাড়ি ঘুরে ভাতের ফ্যানও সংগ্রহ করতো। বছর দশ বয়সের বড়ো ছেলেটি একদিন একটি পাত্রে খানিকটা

ভাতের ফ্যান সংগ্রহ করে এনেছিল। সে প্রথমেই তার মাকে ফ্যান খাবার জন্য অনুরোধ করেছিল। মা ফ্যান না খেয়ে ছেলেটিকে খেতে বলল। সে সময় তার বাবা ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলের হাত থেকে ফ্যানের পাত্রটি কেড়ে নিয়ে অর্ধেক ফ্যান খেয়ে ফেলল। এরপর ছেলেটি আবার তার মাকে ফ্যানে চুমুক দিতে বলল। এবার মা অল্প একটু ফ্যান খেয়েই ছেলেকে বাটি ফেরত দিল এবং ছেলেটি বাকি ফ্যানটুকু খেয়ে নিল। দ্বিতীয় শিশুটির বয়স কয়েক মাস তার ফ্যান খাবার ক্ষমতা ছিল না।[৫]

সে সময়ে একজন সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন অশোকমিত্র তিনি মুন্সিগঞ্জে চাকুরীরত ছিলেন। ১৯৪৩ সালের আগস্ট মাসের তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে,

লোকগুলোকে আমি রাস্তাঘাটে দেখেছিলাম, তাদের অর্ধেকের চোখে কোন ভাষা ছিল না, তাদের চোখ-মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল, তাদের চামড়া শরীরের সঙ্গে কাগজের মতো লেপটে ছিল। কোন কিছু ভাল করে দেখতে গিয়ে তারা যথেষ্ট সময় নিত।... তাদের শরীরের গাঁটগুলো দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল, গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠেছিল বড়ো কালো পিনের মতো।[৬]

এ সময় একমুঠো খাবারের জন্য হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষ ভিড় করে কলকাতার মাঠে-ময়দানে। সামান্য খাদ্যের আশায় তারা ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে। শহরবাসীর ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট সংগ্রহের জন্য এদেরকে রীতিমতো সংগ্রাম করতে হয় রাস্তার কুকুরের সঙ্গে। দুর্ভিক্ষের ভয়াল থাবার পর বাংলার প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। অথচ মৃত্যুপথযাত্রী এই মানুষদের জন্য সরকার পর্যাপ্ত কুইনিন সরবরাহের উদ্যোগও গ্রহণ করেনি। ম্যালেরিয়ার পাশাপাশি ছড়িয়ে পড়ে কলেরা, বসন্ত, যক্ষা এবং আরও নানা প্রাণঘাতী সংক্রামক রোগ, যা দুর্ভিক্ষের সঙ্গে মিলে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ে রূপ নেয়। এই দুর্ভিক্ষ বাংলা ১৩৫০ সালে সংঘটিত হয়েছিল বলে একে পঞ্চাশের মন্বন্তর নামেও অভিহিত করা হয়। দুর্ভিক্ষজনিত অনাহার তার সাথে সাথে অপুষ্টি, অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগেও শত শত মানুষ মৃত্যুবরণ করে। দুর্ভিক্ষ ও সৃষ্ট মহামারিতে ৩৫ থেকে ৩৮ লক্ষ লোক মারা যায়।[৭] ১৭৭০ সালের পর যেসব দুর্ভিক্ষ বাংলায় আঘাত হানে তার মধ্যে এটি ছিল চরমতম। ১৯৪৩ সালে বাংলায় খাজা নাজিমউদ্দীনের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা নাজিমউদ্দীন মন্ত্রিসভা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ১৯৩৮ সাল থেকে এক নাগাড়ে ফসলহানির সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও অনুসঙ্গী আরো কিছু ধ্বংসাত্মক ঘটনার ফলে ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল অবধি বাংলায় ব্যাপক সংখ্যক মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

১৯৪৩ সালের মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ তীব্র ছিল।[৮] কিন্তু এ দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু অব্যাহত ছিল কয়েক বছরব্যাপী। কারণ দুর্ভিক্ষের কারণে হওয়া মহামারী, অপুষ্টি ও বিভিন্ন প্রকার দুর্ভিক্ষজনিত রোগ।[৯] সরকারীভাবে এ দুর্ভিক্ষের মৃত্যুর পরিমাণ ছিল পনের লক্ষ। এ সময় বাংলার জনসংখ্যা ছিল ৬ কোটি। কিন্তু পরে ১৯৫১ সালের সেনসাস রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রকৃত পক্ষে মৃত্যুর পরিমাণ ছিল ত্রিশ লক্ষ। আমেরিকার গবেষক পল আর গ্রিনোর মতে, এ সময় বাংলায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে মৃত্যুবরণ করে।[১০] তাঁর মতে এই দুর্ভিক্ষ ছিল “man-made” অর্মত্য সেনের সাথে একমত পোষণ করে গ্রিনো বলেন যে, ১৯৪৩ সালে বাংলায় খাদ্যাভাব ছিল না। তার মতে,

The famine was causes by a failure of the grain market, precipitated by the disruptive impact of a cyclone of the previous year, the psychological effects of the war in Burma, cut-off of grain imports, and widespread distrust of the government. The effect of these market dislocations fell on an economy that had experienced in the last half-century rapid population growth without an accompanying increase in agricultural yields, and therefore more vulnerable to natural or man-made crises than before. The burger on the food crisis fell disproportionately on the agricultural wage-laborers and sharecroppers, the numbers of whom had grown significantly.

এই বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে দুর্ভিক্ষের পেছনে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, বরং উপনিবেশিক নীতির প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠা এক ভঙ্গুর অর্থনৈতিক কাঠামোও দায়ী ছিল। বিশেষত, কৃষি মজুর ও ভাগচাষিদের মতো দরিদ্র শ্রেণির ওপরই দুর্ভিক্ষের ধ্বংসাত্মক প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছিল।

দুর্ভিক্ষের প্রকৃতি

বাঙালি নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময়কালকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে,

১ম পর্যায়: ১৯৪২ সালের শুরু থেকে ১৯৪৩ সালের মার্চ পর্যন্ত।

২য় পর্যায়: ১৯৪৩ সালের মার্চ থেকে ১৯৪৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত।

৩য় পর্যায়: ১৯৪৩ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত।[১১]

এর মধ্যে দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা শীর্ষে পৌঁছেছিল দুর্ভিক্ষের তৃতীয় পর্যায়ে। যখন মহামারী দেখা দিয়েছিল।[১২] ২য় পর্যায়ে ক্ষুধায় মানুষের মৃত্যু বেড়ে গিয়েছিল। আর ১ম পর্যায় ছিল দুর্ভিক্ষের সূচনা কাল। যখন অনাহারে মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ছিল বিরল। কিন্তু তখন জনগণের আর্থিক বিপর্যয় পুরোপুরি শুরু হয়েছিল। ১৯৪২ সালের ২৮ ডিসেম্বর ভারতের কমিউনিস্ট পার্ট ক্ষুধার্ত জনতাকে নিয়ে মিছিল শুরু করলে সবাই উপলব্ধি করে যে দেশে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে ক্ষুধার্ত মানুষ এসে ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে কোলকাতার রাজপথ পূর্ণ করে ফেলে। এরপর থেকে কোলকাতার বিভিন্ন রাজপথে বেওয়ারিশ লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। যদিও এ সময় দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষকে বাঁচানোর জন্য রিলিফ ও বিভিন্ন স্থানে লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত ছিল। শুধুমাত্র অক্টোবর মাসেই সাহায্য সংস্থার মানুষ কোলকাতা শহরের ৩,৩৬৩টি বেওয়ারিশ লাশ সমাহিত করেছিল। এ সময় কোলকাতায় অসুস্থ, দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ।

দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়েছিল গ্রামে এবং ক্রমে বাংলার সব শহরকে তা স্পর্শ করেছিল। এ দুর্ভিক্ষকের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে অমর্ত্য সেন একে অভিহিত করেছেন, Food Availability Decline (FAD) বলে। তাঁর গ্রন্থ Poverty and Famines (1981)-এ। তাঁর মতে দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয় শুধু মাত্র খাদ্যের অভাবে নয়, একটি দেশে প্রাচুর্যময় খাদ্য থেকেও মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে পারে যদি না সে খাদ্যে সাধারণ মানুষের প্রবেশ থাকে বা তা ক্রয় করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের থাকে। অমত্য সেনের মতে FAD সংঘটিত হবার কারণ প্রাকৃতিক বিপর্যয় (খরা, অনাবৃষ্টি, বন্যা, ঝড়, কীট-পতঙ্গের আক্রমণ প্রভৃতি), যুদ্ধঃ যুদ্ধ খাদ্য উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করে। অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা: অর্থনৈতিক কৃচ্ছতা সাধন, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস। এ ছাড়া রয়েছে সরকারী নীতিঃ সরকারী নীতি যেমন বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কারণে দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়। এসব কারণে বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভাব ঘটে, অনাহারক্লিষ্ঠ জনগণ অখাদ্য খেয়ে অপুষ্টির শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করে। আর অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে বিশাল জনগণের মৃত্যুকে বলে মহামারী। এসবই সংঘটিত হয়েছিল ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের সময়ে। অমর্ত্য সেন-এর মতে ৩টি পদক্ষেপ থেকে FAD থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে, পূর্ব সর্তকতা, খাদ্য সহায়তা আর অর্থনৈতিক উন্নত অবস্থা বা খাদ্য ক্রয়ের মতো আর্থিক সক্ষমতা।

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিটি

১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ চলাকালে সরকার জনতার চাপে জন উডহেডকে চেয়ারম্যান করে ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করে। চেয়ারম্যানের নামানুসারে এ কমিশনের নাম "উডহেড কমিশন"। এ কমিশনের অন্য সদস্যরা ছিল এস, ভি. রামমূর্তি, মনিলাল নানাবতী, এস. আফজাল

লুসাইন ও উব্লিউ, আর এ ক্রুয়েড। কমিশন ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে দিল্লীতে মিলিত হয় এবং বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখে। বাংলায় অবস্থানকালে কমিশন ১৩০ জন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য গ্রহণ করে। কমিশন কর্তৃক দাখিলকৃত রিপোর্ট তিন অংশে বিভক্ত ছিল । এর অন্তর্ভূক্ত ছিল মোট ১৯টি অধ্যায় ও আটটি পরিশিষ্ট । উডহেড কমিশনের মতে, "We have criticized the Government of Bengal for their failure to control the famine."[১৩]

Famine Inquary Commission, India (1945) এর রিপোর্ট অনুযায়ী মন্বন্তরে মারা গিয়েছে ১৫ লক্ষ মানুষ। এই কমিশনের সদস্য ডব্লিব. আর একোর্ড-এর মতে এই হিসেবে পথের ধারে যারা মারা গিয়েছে তাদের। সামগ্রিকভাবে এই মৃত্যুর সংখ্যা ৩০-৪০ লক্ষ। তার মতে এটি মনূষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ "A man made disaster" যা এড়িয়ে যাওয়া যেত।

দুর্ভিক্ষের কারণসমূহ

অনাবৃষ্টি ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়: বাংলায় তিনটি ধানের ফসল রয়েছে: (১) আমন: যা মে ও জুন মাসে বপন করা হয়, নভেম্বর ও ডিসেম্বরে কাটা হয় (শীতকালীন ফসল); (২) আউশ: এপ্রিলের কাছাকাছি বপন করা হয় এবং আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে (শরতের ফসল); এবং (৩) বোরো: নভেম্বর মাসে রোপণ করা হয় এবং ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে (বসন্তের ফসল) কাটা হয়। এ সকল ফসলের মধ্যে শীতকালীন ফসল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে এই তিন প্রকার ফসলেরও ফলন হ্রাস পেয়েছিল যথাক্রমে আমন ৭৩%, আউশ ২৪% এবং বোরো ৩% পর্যন্ত।[১৪] এর মধ্যে শুধু ১৯৪২ সালে আমন ফসলের ফলন বিগত চার বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছিল ৮৩%। এর কারণ ছিল ঐ বছর সংঘটিত অনাবৃষ্টি ছাড়াও অক্টোবর মাসের ঘুর্ণীঝড়, বন্যা ও কীট-পতঙ্গের আক্রমণ ছিল ফসল হ্রাসের কারণ।

১৯৩৩ সাল থেকে খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৪১ সালের চাহিদার তুলনায় ১.৮ মিলিয়ন টন কম চাল উৎপন্ন হয়। ১৯৪৩ সালে ২.৯ মিলিয়ন আমন ধানের ঘাটতি হয়।

এ ছাড়া ১৯৪২ সালের ১৬ অক্টোবর মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণাসহ উপকূলীয় জেলাসমূহে ভয়াবহ ঘুর্ণীঝড় ও জলোচ্ছাসের ফলে প্রায় ৩২০০০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ৭৪০০ টি গ্রাম সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস হয়।[১৫] ঘুর্ণীঝড় ও জলোচ্ছ্বস কেবল জমির আমন ধানই নষ্ট করে নি, মজুদ খাদ্যও নষ্ট করে।

অবিভক্ত বাংলায় বাৎসরিক গড় চাল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯.৫০ মিলিয়ন টন। কিন্তু বাংলার কৃষি প্রকৃতি নির্ভর হওয়ায় বছরে বছরে খাদ্য উৎপাদন কম বা বেশি হয়। এ সময় ১৯৩৬ সালে ৮ মিলিয়ন টন, ১৯৩৭ সালে ১১.৪ মিলিয়ন টন এবং ১৯৪২ সালে ৮.৯ মিলিয়ন টন খাদ্য উৎপাদন হয় এবং খাদ্য ঘাটতি থাকে ২.৯ মিলিয়ন টন।[১৬] ১৯৪৩ সালে বাংলায় ৪৩ সপ্তাহের খাদ্য উৎপাদিত হয় এবং ১৯৪২ সালের উৎপাদন থেকে ৬ সপ্তাহের খাদ্য যোগান দেওয়া হয় অর্থাৎ ১৯৪৩ সালে ৪৯ সপ্তাহের খাদ্য ছিল। ১৯৪৫ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন মনে করে যে, খাদ্যর ঘাটতির পরিমাণ এত বেশি নয় যে, তার কারণে দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হতে পারে। ঘাটতি খাদ্য সাধারণত বার্মা থেকে আমদানী করা হতো, কিন্তু ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে বার্মা জাপান কর্তৃক অধিকৃত হয়। ফলে বাংলার একটি খাদ্যের উৎস বন্ধ হয়ে যায়।

সরকারী বিধি-নিষেধ, নীতি ও নিয়ন্ত্রণ : ১৯৪৩ সালের বাংলা দুর্ভিক্ষের প্রাক্কালে ব্রিটিশ সরকার কর্ডনিং প্রথা (Cordon System) চালু করেছিল। এটি ছিল খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণের একটি নীতি, যা মূলত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে চাল-ধানের প্রবাহ আটকাতে ব্যবহৃত হতো। কর্ডনিং প্রথা বলতে বোঝায়- জরুরি পরিস্থিতিতে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলকে ঘিরে ফেলে সেখানকার সম্পদ (এক্ষেত্রে খাদ্যশস্য) অন্যত্র পাঠানো

বন্ধ করা। ব্রিটিশ সরকার এটি চালু করেছিল দুটি উদ্দেশ্যে, প্রথমত: সামরিক চাহিদা মেটানো। দ্বিতীয়: মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ। খাদ্যশস্যের অভাব ও মূল্যবৃদ্ধি রোধে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল বলে ব্রিটিশ সরকার দাবি করেছিল। কিন্তু বাস্তবে, এই প্রথা দুর্ভিক্ষের তীব্রতা বাড়িয়েছিল।[১৭]

এ প্রথার আইনে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে বাংলায় খাদ্যশস্য আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।[১৮] রেলগাড়ি, স্টিমারসহ সর্বপ্রকার যানবাহন সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকার ফলে বাংলার বাইরে থেকে খাদ্য আমদানিতে বা বাংলার অভ্যন্তরের জেলাগুলোর মধ্যে খাদ্য শস্যের অবাধ চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়।[১৯] পাঞ্জাব সরকার বাংলার এই সংকটে গম ও আটা পাঠাতে রাজী হলেও দেশে কর্ডনিং প্রথার জন্য তা আমদানি করা সম্ভব হয় নি।[২০]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ব্রিটিশ সরকারের জাপান ভীতি

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান বার্মা আক্রমণ করে এবং তারা রাজধানী রেঙ্গুন দখল করে **১৯৪২** সালের ৮ মার্চ। **১৯৪১** সালের ২৩ ডিসেম্বর জাপান চট্টগ্রামে বোমা বর্ষণ করে। এ ছাড়া জাপান **১৯৪৩** সালের ২৯ জানুয়ারি কোলকাতায় বোমা ফেলে। এরপর বাংলা জাপান ও আজাদ হিন্দু বাহিনীর আক্রমণের ক্ষেত্র হবে বিবেচনা করে ব্রিটিশ সরকার ভীত হয়ে পড়ে। তারা পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করে। সমুদ্র তীরবর্তী মেদিনীপুর, বাকেরগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনা জেলার মজুদ চাল ও ধান অন্যত্র সরিয়ে নেয়।

এ ছাড়া কোন নৌযান যেন জাপানী বাহিনীর হাতে না পড়ে সেজন্য ব্রিটিশ সরকার বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের **১০** জন অথবা তার অতিরিক্ত যাত্রী বহনে সক্ষম এ রকম প্রায় সাড়ে ছেষট্টি হাজার দেশি নৌকা ধ্বংস করে। ফলে দক্ষিণবঙ্গে নৌচলাচল বন্ধ হয়ে যায়।[২১] এতে ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন বন্ধ হয় তেমনি অসংখ্য মাঝি-মাল্লাও বেকার হয়ে পড়ে। এসময় জেলেরা এত ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল যে, একমাত্র চট্টগ্রাম জেলার ৮০ ভাগ জেলে লঙ্গরখানায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।[২২]

বার্মার পতন বাংলাকে যুদ্ধের নিকটে নিয়ে আসে। ফলে বাংলা প্রদেশে সামরিক ছাউনি, বাংকার, বিমান বন্দর, রাস্তা প্রভৃতি সামরিক ও বেসামরিক নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতির চাপ বৃদ্ধি পায়। কারণ যুদ্ধের খরচ মেটাতে সরকার নোট মুদ্রণের আশ্রয় নেয়। এতে খাদ্যশস্যের মূল্য ভোক্তাদের নাগালের বাইরে চলে যায়।

যুদ্ধের সময় বাংলায় প্রায় ৩০ লক্ষ সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল। দুর্ভিক্ষের আভাস পেয়ে সরকার সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে গুদামজাত করে রাখবার ফলে বাজারে খাদ্য শস্যের ঘাটতি দেখা দেয়। এ সময় সরকার সংগ্রহ করে বাংলার বাইরে সুদূর জব্বলপুরে নিয়ে গিয়ে তা গুদামজাত করে রাখে।[২৩] এতে খাদ্য সংকট তীব্র হয়ে উঠে। সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বাংলা আক্রান্ত হওয়া দুর্ভিক্ষের একটি বড় কারণ ছিল। এ প্রসঙ্গে বি এম ভাটিয়া মন্তব্য করেছেন, "From 1910 to 1940 there were 18 scarcities, but there was no loss of life due to starvation over the antire period."[২৪]

মজুতদারী

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের আর একটি বড় কারণ ছিল খাদ্যের মজুদতারি। সে সময়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বসহ ও বড় ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফার আশায় খাদ্য মজুত করা শুরু করে। কলকাতায় জাপানী বিমান আক্রমণের প্রেক্ষিতে সরকার কলকাতার মজুদসমূহ অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার সাথে সাথে ব্যবসায়ীদের মধ্যে থেকে সাতজন এজেন্ট নিয়োগ করে খাদ্য সংগ্রহ অভিযান শুরু করে। এ সময় সরকার ক্রয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে দেয়। এজেন্টগণ সরকারের নামে চাল ক্রয় করে নিজেদের মজুদ বৃদ্ধি করে এবং মুনাফার লোভে বেশি দামে তা কালোবাজারে বিক্রি করে।[২৫]

অনেকের মতে, চালের সরবরাহ যথেষ্ট থাকলেও অসাধু ব্যবসায়ী ও দুর্নীতিবাজ আমলাদের কারণে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি পায় । দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের মতে, অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ অকৃষিজীবী গরীব মানুষ প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য ক্রয়ের মতো অর্থ সংগ্রহ করতে পারে নি। এরা গ্রাম থেকে শহরে ভীড় করে এবং খাদ্যের অভাবে মৃত্যুবরণ করে।

সরকার ও দুর্ভিক্ষ

এ সময় ভারতের ইংরেজ ভাইসরয় লিনথিনগো বিদায় নেন ও তার স্থলে লর্ড ওয়াভেল যোগ দেন। কিন্তু ঔপনিবেশিক এই সরকার দুর্ভিক্ষ নিরোধে তেমন কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করে নি। খোদ ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টন চার্চিল মহাযুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করায় এদিকে দৃষ্টি দেয়ার সামান্য চেষ্টাই করেন। দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় প্রদেশে শ্যামা-হক মন্ত্রীসভার ব্যর্থতার ফলে ১৯৪৩ সালে এ সরকারের পতন ঘটে। খাজা নাজিমউদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী নিয়োজিত হন। প্রাদেশিক সরকার দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় সমগ্র প্রদেশে কিছু ত্রাণ ব্যবস্থা চালু করে। যা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল অপর্যাপ্ত। ব্রিটিশ প্রশাসন দুর্ভিক্ষ বা বাংলার জনগণকে রক্ষার চাইতে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাঁদের বিজয়কে।

সরকার খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য পাঁচ হাজার লাইসেন্স বিলি করেছিল। আর এ সব লাইসেন্সধারীরা বিনা অনুমতিতে চাল মজুত করতে পারতো। আর এসব ব্যবসায়ীরা শত শত মণ চাল মজুত ও দুর্ভিক্ষের সময় তা ব্যবহার না করে হাজার হাজার দেশবাসীর মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠে।[২৬]

এ ছাড়াও দুর্ভিক্ষের কারণ ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের চাল মজুদ করে রাখা। এ সময় যশোর থেকে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার মণ চাল কিনে তা রেলওয়ে প্লাটফর্মে গাদা করে রাখা হয়েছিল। জেলা প্রশাসক মজুত এই খাদ্য ধরে রাখেন তা দুর্ভিক্ষপীড়িতদের দেওয়া হয় নাই। একইভাবে কোলকাতার পাশেই বোটানিক্যাল গার্ডেনে ৯০ হাজার টন খাদ্যশস্য ত্রিপলের নিচে মজুত করে রাখা হয়, যা দুর্ভিক্ষের সময় ব্যবহার করা হয় নাই। এই শষ্য পচে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এ খাদ্য জনগণকে দেওয়া হয় নাই।[২৭]

জাপান কর্তৃক বার্মা অধিকৃত হওয়ায় ব্রিটিশ প্রশাসন ভীত হয়ে পড়ে। বাংলা আক্রান্ত হতে যাচ্ছে ভেবে। তাদের হাতে যেন কোন সম্পদ না পড়ে সে উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ প্রশাসন ১৯৪২ সাল থেকে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে 'পোড়ামাটি' নীতি কার্যকর করে। বাংলায় জলপথে খাদ্য ও মানুষ চলাচলের মাধ্যম নৌযান যাতে জাপানি বাহিনীর হাতে না পড়ে সেজন্য ব্রিটিশ সরকার বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের ১০ জন অথবা তার অতিরিক্ত যাত্রী বহনে সক্ষম এ রকম যানবাহন ধ্বংস করে। ফলে দক্ষিণবঙ্গে নৌচলাচল বন্ধ হয়ে যায়।[২৮] এতে ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন বন্ধ হয় তেমনি অসংখ্য মাঝি-মাল্লা বেকার হয়ে পড়ে। এসময় জেলেরা এত ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

বাংলার গভর্ণর স্যার জন হারবাট, ১৯৪২ সালের ২ এপ্রিল লেজিসলেটিভ এসেম্বিতে বলেন, "The other form of denial of facilities to the enemy that is intended in the districts is to prevent any means of transport from falling into his hands."[২৯]

বার্মার পতন বাংলাকে যুদ্ধের নিকটে নিয়ে আসে। ফলে বাংলা প্রদেশে সামরিক ছাউনি, বাংকার, বিমান বন্দর, রাস্তা প্রভৃতি সামরিক ও বেসামরিক নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এই যুদ্ধের খরচ মেটাতে গিয়ে সরকার অবাধে টাকা ছাপানো শুরু করে ফলে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। দ্রব্যমূল জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। পল গ্রীনোর মতে, "In my view, the really difficult period of a famine begins when the rural patrons exhaust their resources and no longer able to succor their dependents."[৩০]

দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন মিত্রবাহিনীর খাদ্য ও রদস সরবরাহের দায়িত্ব পায় দেশীয় ব্যবসায়ীরা। এরা অধিক লাভের আশায় এ সময় খোলাবাজারে পণ্য বিক্রি বন্ধ রাখে এবং হাজার হাজার মণ ধান, চাল, ডাল, আটা মজুত করে। প্রশাসন এদের নিবৃত্ত করেনি বরং ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে এরা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।[৩১]

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে বালাম চালের মণ প্রতি মূল্য ছিল ৭ টাকা থেকে ৭ টাকা ৪ আনা। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে ৭ টাকা ১২ আনা থেকে ৮ টাকা। ডিসেম্বরে ১৩ টাকা থেকে ১৪ টাকা। ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে তা পৌঁছায় ১০৫ টাকায়।

খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি

১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে এক মণ চালের দাম ছিল ১৩-১৪ টাকা ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাসে ছিল ১১ টাকা ৪ আনা মণ ১৯৪৩ সালের মার্চে তা দাঁড়ায় ২১ টাকা, মে মাসে ৩০ টাকা, আগস্ট মাসে ৩৭ টাকা। চট্টগ্রামে ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে চালের দাম পৌঁছায় ৮০ টাকা মণ। ঢাকায় ১০৫ টাকা মণ।[৩২]

১৯৪৩ সালে জানুয়ারি থেকে মে মাসে চালের পাইকারী মূল্য তালিকা ছিল নিম্নরূপ।[৩৩]

মাস	পরিমাণ মণ	টাকা	আনা
জানুয়ারি	১	১১ টাকা	১২
ফেব্রুয়ারি	১	১৩	৮
মার্চ	১	২০	৬
এপ্রিল	১	২৩	৬
মে	১	২৯	১২

১৯৪৩ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ চলাকালে চালের দামের তালিকা

তারিখ	মূল্য	ইনডেক্স
১৯৪২ জানুয়ারি	৫.৬৩	১০০
১৯৪২ জুলাই	৮.০০	১৪২
১৯৪২ অক্টোবর	৮.৫০	১৫১
১৯৪৩ জানুয়ারি	১২.৩১	২১৪
১৯৪৩ মার্চ ১৭	১৯.৩৮	৩৪৪
১৯৪৩ মার্চ ২৯	২২.০০	৩৯১
১৯৪৩ এপ্রিল ১২	২০.৪৪	৩৬৩
১৯৪৩ এপ্রিল ২৬	২১.০০	৩৭৩
১৯৪৩ মে ১০	২৫.০০	৪৪৪
১৯৪৩ মে ২৮	৩১.৫০	৫৬০
১৯৪৩জুন ১১	৩৪.০০	৬০৪
১৯৪৩ জুন ২৫	৩১.৫০	৫৬০
১৯৪৩ জুলাই ১৬	৩২.৫০	৫৭৭
১৯৪৩ জুলাই ৩০	৩৩.০০	৫৮৬
১৯৪৩ আগস্ট ২০	৩৭.০০	৬৫৭

তথ্যসূত্র: FIC (1945), p. 40, p. 218, এবং Ghosh, Famines in Bengal, 1770–1943 (Calcutta, 1944), p. 44.

১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে দুর্ভিক্ষের চূড়ান্ত অবস্থায় মূল্য বৃদ্ধি সর্বোচ্চ আকার ধারণ করে। কলকাতায় ১৯৪৩ সালের ৩ মার্চ যে মোটা চালের মণপ্রতি দাম ১৫ টাকা ছিল তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৭ মে তারিখে প্রায় ৩১ টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় প্রতি মণ চাল ৬ টাকায় কমে বিক্রি হয়েছিল। সংকট বিস্তার লাভ করায় ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি থেকে কোনো কোনো জেলায় প্রতিমণ চাল ৮০ টাকা থেকে ১০০ টাকার উপরে বিক্রি হয়। ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে তা পৌঁছায় ৮০ থেকে ১০৫ টাকা মণে। লোভী মজুতদারেরা কুইনিন মজুত করে রাখে ত্রিশ টাকার কুইনিন এ সময় তিনশত টাকায় বিক্রি হয়েছে।[৩৪]

দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষদর্শী

প্রত্যক্ষদর্শীরা বর্ণনা করেছেন সে সময় শকুন ও কুকুরে খাওয়া মরদেহ জমিতে ও নদীর ধারে পড়ে থাকার কথা। এতো মৃতদেহের সৎকার করার ক্ষমতাও কারো ছিল না। গ্রামে যাদের মৃত্যু হয়নি তারা খাদ্যের সন্ধানে শহরাঞ্চলে চলে যান। বিভিন্ন গ্রাম থেকে তখন বুভুক্ষ হাজার হাজার মানুষ একমুঠো অন্নের আশায় স্রোতের মতো ধেয়ে এসেছে কলকাতার দিকে। দেখা গেছে, এসব অভাগা দলে দলে পথের ওপর পড়ে ধুঁকছেন আর আবর্জনার পাশে উচ্ছিষ্টে ভাগ বসাতে পরস্পর লড়ছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর আত্মজীবনীতে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে,

> ১৯৪৩ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে।... দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। গ্রাম থেকে লাখ রাখ লোক শহরের দিকে ছুটেছে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে। খাবার নাই, কাপড় নাই। ইংরেজ যুদ্ধের জন্য সমস্ত নৌকা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে। ধান, চাল সৈন্যদের খাওয়াবার জন্য গুদাম জব্দ করেছে। যা কিছু ছিল ব্যবসায়ীরা গুদামজাত করেছে। ফলে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবসায়ীরা দশ টাকা মণের চাউল চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করছে। এমন দিন নাই রাস্তায় লোকে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায় না।... মা মরে পড়ে আছে, ছোট বাচ্চা সেই মরা মার দুধ চাটছে। কুকুর ও মানুষ একসাথে ডাস্টবিন থেকে কিছু খাবার জন্য কাড়াকাড়ি করেছে। ছেলেমেয়েদের রাস্তায় ফেলে দিয়ে মা কোথায় পালিয়ে গেছে। পেটের দায়ে নিজের ছেলেমেয়েকে বিক্রি করতে চেষ্ট করছে। কেউ কিনতেও রাজি হয় নাই। বাড়ির দুয়ারে এসে চিৎকার করছে, মা বাঁচাও, কিছু খেতে দাও, মরে তো গেলাম, আর পারি না, একটু ফেন দাও।' এ কথা বলতে বলতে ঐ---বাড়ির দুয়ারের কাছেই পড়ে মরে গেছে।[৩৫]

প্রখ্যাত ভারতীয় অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষের স্মৃতিচারণ করেছেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ৮ বছর। তার মতে,

> প্রত্যেককে কঙ্কালের মতো দেখাতো, মনে হতো শরীরের কাঠামোর ওপরে শুধু চামড়া লাগানো, ... ভাত রান্নার সময় যে মাড় তৈরি হয়, লোকজন সেটার জন্য কান্নাকাটি করতো। কারণ তারা জানতো যে তাদেরকে তখন ভাত দেওয়ার মতো কেউ ছিলো না। একবার যে এই কান্না শুনেছে সে তার জীবনে কখনো এই কান্নার কথা ভুলতে পারবে না। এখনো সেসব নিয়ে কথা বলতে গেলে আমার চোখে জল চলে আসে। আমি আমার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না।[৩৬]

ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর শীর্ষস্থানীয় একজন কর্মকর্তা এবং সেসময়ে ভারতের ভাইসরয় আর্চিবাল্ড ভ্যাবেল বেঙ্গলের দুর্ভিক্ষকে ব্রিটিশ শাসনামলের অন্যতম বড় এক বিপর্যয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, এর ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাবমূত্রির যে ক্ষতি হয়েছিল সেটা অপরিমেয়। দুর্ভিক্ষ থেকে যারা বেঁচে গেছেন তারা এতে অতন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

১৯৪২ সালে বার্মার পতনের পর সেখনে বসবাসরত বাঙালি জনগোষ্ঠীর বড় অংশ স্বদেশে ফিরে আসে এবং বাংলার জনসংখ্যা লক্ষণীয় হারে বৃদ্ধি পায়। সংবাদ সাময়িকী শনিবারের চিঠি (জৈষ্ঠ ১৩৪৯) বিষয়টি উপস্থাপন করেছে এভাবে,

যুদ্ধের দরুণ আমাদের বাংলাদেশে নিদারুণ অন্নসমস্যা দেখা দিতেছে।... ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ভারতবাসী অন্তত কিছুদিনের জন্য বাংলাদেশে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে। এই সকল দেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ পথই বাংলাদেশ। যুদ্ধের জন্য সহস্র সহস্র নতুন লোকেরও আমদানি এখানে হইয়াছে, ফলে অন্ন সমস্যা মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে।[৩৭]

দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভ

বাংলা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। ত্রিশের দশকে বাংলাকে বার্মা থেকে খাদ্য আমদানী করতে হতো। অবশ্য এই আমদানী নগণ্য পরিমাণেই ছিল ১৯৩৪ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত তার পরিমাণ ছিল বাৎসরিক ৩ লক্ষ টনের কম।[৩৮] যা ছিল বাংলার প্রয়োজনীয় খাদ্যের ৪% মাত্র। বাংলার প্রতি বছর খাদের প্রয়োজন হতো ৮.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন।[৩৯] কিন্তু এ বছর আমন ফসল পর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে। ১৯৪২ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলায় ঝড় ও প্লাবন ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে, ফলে এ এলাকায় খাদ্যাভাব দেখা দেয়। মেদিনীপুরের ৩,৩০০ বর্গমাইল এলাকার ফসল আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয় এবং আরো ৯০০ বর্গমাইল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আর এ সাইক্লোনে ১ লক্ষ ৮০ হাজার গবাদি-পশু প্রাণ হারায়।[৪০] এরপর আসে পতঙ্গ আক্রমণ যা ক্ষেত্রের ধানকে বিনষ্ট করে। এভাবে দেখা যায় ১৯৪২ সালে মোট উৎপাদনের ৫% শষ্য বিনষ্ট হয়। সব মিলিয়ে ১৯৪৩ সালে বিগত পাঁচ বছরের গড় উৎপাদিত শষ্যের চাইতে ১০% ফসল উৎপাদন কম হয়।[৪১] অমর্ত্য সেন এসব বিষয়কে পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, বিনষ্ট ফসল বাদ দিলেও ১৯৪৩ সালের বাংলায় যে পরিমাণ শস্য ছিল তা দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হবার মতো নয়। কারণ বিগত বছরগুলোতে এর চাইতেও কম শষ্য উৎপাদিত হয়েছিল কিন্তু দুর্ভিক্ষ হয় নাই। এরপরও খাদ্যমূল্য বেড়ে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয় এর কারণ ছিল ১৯৪২ সালের শেষে খাদ্য সরবরাহে অনিশ্চয়তা, ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি, কোলকাতার ব্যবসায়ীদের অস্থিরতা আর সরকার কর্তৃক বার বার প্রচার করা যে, জাপানী আক্রমণ সমাগত প্রায়। এ সবের ফলে খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। ১৯৪২ সালের অক্টোবরে কোলকাতায় এক মণ চালের মূল্য ছিল ৭ টাকা তা বেড়ে বছরের শেষে পৌঁছে ১২ টাকায়। তবে পূর্ববর্তী বছরগুলিতে দেখা গেছে যে চালের দাম খুব কম সময়ই মণপ্রতি ৫ টাকার বেশী বেড়েছে।

১৯৪৩ সালের প্রথমে সাইক্লোনপীড়িত দুই জেলায় ব্যাপক খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এ ছাড়া এ সময় চট্টগ্রাম জেলাও খাদ্যের ব্যাপক অভাব দেখা যায়। বার্মায় বসবাসরত শত শত বাঙালি চট্টগ্রাম দিয়ে আসা শুরু করে। পাশাপাশি চট্টগ্রামে ব্যাপক ব্রিটিশ সেনার উপস্থিতি জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

এ সময় রিলিফ দেবার ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু আন্তঃজেলা পণ্য পরিবহরে সরকারী বিধি-নিষেধ আরোপ সমস্যা দেখা দেয়। এরমধ্যে ১৯৪৩ সালের ২০ ডিসেম্বর কোলকাতায় জাপানী যুদ্ধবিমান বোমাবর্ষণ করে।[৪২] এতে ৬০ জনের প্রাণহানি ঘটে। এ ছাড়া ১৯৪৩ সালের ২০ ও ২৪ ডিসেম্বর জাপানী বিমান চট্টগ্রামে বোমাবর্ষণ করে তাতে ১০০ মানুষ নিহত ও ২০০ জন আহত হয়। এই বোমাবর্ষণ মানুষ-জনকে আতঙ্গিত করে ও ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করে খাদ্য মজুদ করার।[৪৩]

মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ

১৯৪৩ সালে হওয়া বাংলার দুর্ভিক্ষের পেছনে প্রাকৃতিক কারণ খুঁজে পায়নি ভারতীয় ও মার্কিন গবেষকদের একটি দল। অর্থাৎ, ভয়াবহ ওই দুর্ভিক্ষের জন্য আবহাওয়া নয় বরঞ্চ তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের অমানবিক নীতিই দায়ী ছিলো। তার নীতির কারণে সৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষে সে সময় প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রায় ৩০ লাখ মানুষ।

১৮৭৩, ১৮৭৬, ১৮৭৭, ১৮৯৬-৯৭, ১৮৯৯ এবং ১৯৪৩ সালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। গবেষকরা এই ছয়টি বছরের মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ করে সে সময়ের বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার তথ্য সংগ্রহ করেন। এতে দেখা যায়, প্রথম পাঁচটি দুর্ভিক্ষের মূল কারণ ছিল খরা, কারণ ওই বছরগুলিতে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক কম ছিল এবং তাপমাত্রা ছিল বেশ বেশি। তবে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্রে তেমন কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রমাণ মেলেনি।

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে, ১৯৪৩ সালে বাংলায় খাদ্যের মজুদ যথেষ্ট থাকলেও, যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি, মজুদদারি এবং ফটকা বাণিজ্যের কারণে খাদ্যের দাম এতটাই বেড়ে যায় যে, দরিদ্র মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। "চার্চিলস এম্পায়ার" বইয়ের লেখক রিচার্ড টয়ও চার্চিলের অবহেলাকে এর একটি প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার মতে, চার্চিল ইউরোপে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিয়ে এতটাই ব্যস্ত ছিলেন যে, বাংলার দুর্ভিক্ষের দিকে মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হন।

গবেষণায় দেখা যায় যে, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ খরার কারণে হয়নি, যদিও পূর্ব ভারতের কিছু অংশ ১৯৪০ ও ১৯৪১ সালে খরার সম্মুখীন হয়েছিল। তবুও, ১৯৪৩ সালে গড় বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক ছিল। এই বিষয়ে ইতিহাসবিদ সুগতা বসুর মতে,

“The government of India were unable to impress upon London the desperate need for external supplies. The famine was not even officially acknowledged in the British Parliament until Ocber 1943.”[88]

১৯৪৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর এই দুর্ভিক্ষ মানব সৃষ্টি বলে অভিযোগ করে।[৮৫] একই মত প্রকাশে করেন পল গ্রীণো, তাঁর মতে, “Although the famine was not precipitated by crop-failure---it was a price-famine, caused by war-time market disturbances.”[৮৬]

একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন আমেরিকার ঐতিহাসিক পল গ্রীনো। তাঁর মতে, “Although the famine was not precipitated by crop-failure ----it was a price-famine, caused by war-time market disturbances.”[৮৭]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানও এ দুর্ভিক্ষের দায় চাপিয়েছেন ব্রিটিশ প্রশাসনের উপর তাঁর মতে,

> ইংরেজদের কথা হলো, বাংলার মানুষ যদি মরে তো মরুক, যুদ্ধের সাহায্য আগে। যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রথম স্থান পাবে। ট্রেনে অস্ত্র যাবে, তারপর যদি জায়গা থোকে তবে রিলিফের খাবার যাবে। যুদ্ধ করে ইংরেজ, আর না খেয়ে মরে বাঙালি; যে বাঙালির কোন কিছুরই অভাব ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলাদেশ দখর করে মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায়, তখন বাংলার এত সম্পদ ছিল যে, একজন মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ী গোটা বিলাত শহর কিনতে পারত। সেই বাংলাদেশের এই দুরবস্থা চোখে দেখেছি।[৮৮]

দুর্ভিক্ষের শেষের দিকে ১৯৪৩ সালের ১ অক্টোবর লর্ড ওয়াভেল ভারতের ভাইসরয় হয়ে আসেন। এ দুর্ভিক্ষ নিরসনে তিনি স্বচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ভারতে খাদ্য আমদানীর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। আর এ ব্যর্থতার কারণ হিসেবে তিনি নিজেই লিখেছেন, “The vital problems of India are being treated by His Majesty’s Government with neglect, even sometimes with hostility and contempt.”[৮৯]

দুর্ভিক্ষে উইলস্টন চার্চিলের দায়

জার্মান প্রবাসী মধুশ্রী মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক সময়ের গবেষণা থেকে জানা যায়, বাংলায় দুর্ভিক্ষের বিষয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলস্ট চার্চিল ছিলেন নির্লিপ্ত। ভারতীয় ব্রিটিশ প্রশাসনকে দুর্ভিক্ষ নিরসনকল্পে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ তিনি কখনোই দেন নাই। সে সময়ের ভারতের গভণর্র জেনারেল লর্ড

ওয়াভেন দুর্ভিক্ষ নিরসনের জন্য ভারতের অভ্যন্তর বা বিদেশ থেকে শস্য আমদানী করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে তা সকল পদক্ষেপকে তিনি নিরুৎসাহিত করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য গম দেবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন শর্ত ছিল তা ব্রিটিশদের নিজেদের জাহাজে করে ভারতে আনতে হবে। এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে ওয়াশিংটনে ব্রিটিশ প্রতিনিধি বলেছিলেন যে, ভারতীয়দের খাদ্যের প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব ব্রিটিশদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হোক।[৫০]

ওই সময় যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া সহায়তার হাত বাড়াতে চেয়েছিল, কিন্তু চার্চিলের মন্ত্রিসভা তা মেনে নেয়নি। এমনকি এক পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র যখন নিজের জাহাজে করে খাদ্য পাঠাতে চেয়েছে, ব্রিটিশ শাসক সেটিও গ্রহণ করেনি। জিওফিজিক্যাল রিসার্চ লেটার জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী এই দুর্ভিক্ষের পেছনে প্রাকৃতিক কারণ খুঁজে পায়নি ভারতীয় ও মার্কিন গবেষকদের একটি দল। অর্থাৎ এই দুর্ভিক্ষের জন্য আবহাওয়া নয় বরং তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের অমানবিক নীতিই দায়ী ছিলো। ১৯৪২-এর ডিসেম্বর থেকে ব্রিটিশ সরকারের নথিপত্র ঘাঁটলে দেখা যায়, একাধিক পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা যেমন বাংলার গভর্ণর জন হারবার্ট, ভারতের ভইসরয় লর্ড লিনলিথগো, ভারতের সেক্রেটারি অব স্টেট লিও আমেরি, ভারতে ব্রিটিশ বাহিনীর প্রধান জেনারেল ক্লড অকিনলেক এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুপ্রিম সেনা কমান্ডার লর্ড মাউন্টব্যাটেন পর্যন্ত ক্রমাগত সুপারিশ করে যান, ভারতে খাদ্য আমদানির অনুমতি দেওয়া হোক। মাসের পর মাস তাদের আর্জি বাতিল হয়। না হয় প্রয়োজনের তুলনায় নামমাত্র আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়।[৫১]

এ দুর্ভিক্ষের দায় কিছুতেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলস্টন চার্চিল এড়াতে পারেন না। মধুশ্রী মুখার্জি সহযোগীদের নিয়ে ৭ বছর ধরে অজানা অনেক নথিপত্র ঘেঁটে ২০১০ সালে বই লেখেন, যার নাম *Churchill's Sectet War: The British Empire and the Ravaging of India during World War II* বা 'চার্চিলের গোপন যুদ্ধ'- তার মতে, চার্চিল নিজে সরাসরি বাংলার মন্বন্তরের জন্য দায়ী ছিলেন- বাংলায় যখন খাদ্য সংকট চলছে, সেটা মোকাবেলায় তিনি কোনও পদক্ষেপই নেন নি। বরং তার যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা ইউরোপের বেসামরিক মানুষদের জন্য খাদ্য মওজুদ গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছে। ভারতে যখন খাদ্যের অভাবে মানুষ মরছে, তখন তার পাশ দিয়েই অস্ট্রেলিয়া থেকে এক লাখ সত্তর হাজার গম বহনকারী জাহাজ গেছে ইউরোপে।[৫২] মধুশ্রী মুখোপাধ্যায়, ভারত সচিব এমিরিওর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এভাবে, "আমি যতটা পারি ভারতীয়দের খাদ্যের জন্য লড়াই করেছি। তবে উইলস্টোন এটা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন যে, কিছু করা উচিত, তবে এই যুদ্ধে ভারতীয়রা শুধুমাত্র ক্ষুধাপীড়িত নয়, এবং যুদ্ধ যত এগিয়ে যাবে, গ্রীস যাতে খাদ্য পায়, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ।"[৫৩] চার্চিলের এই বক্তব্যের অর্থ মধুশ্রী মুখোপাধ্যায়ের মতে, "বাঙালির আহারের কষ্ট স্বাস্থ্যবান গ্রীকদের চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ।" "পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে কিন্তু একজনও সাদা চামড়ার মানুষের মৃত্যু হয়নি। মোদ্দাকতা হল ভারতের সাধারণ মানুষের প্রাণের দাম কানাকড়িও ছিল না।"[৫৪] "পোড়ামাটি নীতি (Scorched Earth Policy) এ বিষয়ে শশী থারুর মন্তব্য করেছেন,

> They (The British) had presided over one of the worst famines in human history, the Bengal Famine of 1943, while diverting food (on Churchill's personal orders) from starving civilians to well-supplied Tommies. Even Lord Wavell, who had been rewarded for military failure by succeeding Linlithgow as viceroy, considered the British government's attitude to India 'negligent, hostile and contemptuous to a degree I had nor anticipated.[৫৫]

দুর্ভিক্ষে বাংলায় বিপুল প্রাণহানির খবর শুনে চার্চিল বলেছিলেন, 'I hate Indians. Beastly people with a beastly religion. The famine was their own fault for breeding like rabbits.'[৫৬]

বাংলায় ত্রাণ সাহায্য পাঠানোর হাজার আবেদন সত্ত্বেও তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সেই কাজ করতে দেন নি। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া ত্রাণ পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও চার্চিল ও তাঁর মন্ত্রীরা সেই অনুমতি দেন নি।[৫৭]

ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনলজির অধ্যাপক ও এই গবেষণার প্রধান গবেষক বিমল মিশ্র ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানকে বলেছেন, জিওফিজিক্যাল রিসার্চ লেটার নামের সাময়িকীতে প্রকাশিত ওই গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, এটা ছিল এক অভাবনীয় দুর্ভিক্ষ; এর জন্য বৃষ্টিপাত কম হওয়া যতোটা দায়ী, তার চেয়ে অনেক বেশি দায়ী সরকারি নীতির ব্যর্থতা। ওই গবেষণা অনুযায়ী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ফসলে পোকার আক্রমণের বিস্তৃতির পাশাপাশি আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মা ব্রিটিশদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে সরবরাহ ব্যবস্থায় তীব্র ধস নেমেছিল, দুর্ভিক্ষের বড় কারণ সেটাই। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বাংলার দুর্ভিক্ষ দূর করার বা বিদেশ থেকে বাংলার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করার কোন চেষ্টা করেন নাই। বরং যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা বিনামূলে খাদ্য দেবার প্রস্তাব দিলেও তা নিতে তিনি অস্বীকৃতি জানান।[৫৮]

শিল্প ও সাহিত্যে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ

মেদিনীপুর জেলায় সৃষ্ট খাদ্য ঘাটতি সারা বাংলার খাদ্য পরিস্থিতির উপর প্রভাব ফেলে। এ নিয়ে প্রচলিত ছড়া রয়েছেঃ

তেরশ পঞ্চাশ সালে আইলো খরা আর বান
ঘরবাড়ী সউগ গেল পড়ি
ডুবি গেল ধান ।
কুলাইগাছি আর ঘাগরারচর
এর ভেতরে হাহাকার বাপ
নন্দীপাড়ার নোই সন্ধান
....
মেদিনীপুরোতে বান হায়রে অমপুরোত খরা
জমি-জিরাত সউগ জ্বলি গেইছে
হামরা ঘাটের মরা।[৫৯]

দুর্ভিক্ষ নিয়ে কবিতা লিখেছেন কবি মঙ্গলাচরণ।

অনেকদিন অধেক দূর রেললাইন ধরেই জীবন থেকে পালাই।
উনিশশো তেতাল্লিশ উনিশ শো চুয়াল্লিশ শহর থেকে শহর।
বাংলাদেশে হারিয়ে যাই, বাংলাদেশ ছাড়াই। পথের শেষে খবর।[৬০]

পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপর ভিত্তি করে লেখা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় "অশনি সংকেত" নামের উপন্যাস রচনা করেন। পরে ১৯৭৩ সালে সত্যজিৎ রায় সেটি অবলম্বন করে একই নামে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬) ১৯৪৩ সালের বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় তৎকালীন পূর্ব বাংলার এক প্রতিশ্রুতিশীল যুবা শিল্পী ছিলেন। দুর্ভিক্ষের সেই মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা, মানুষের অসহায়তা, চরম দারিদ্র্য ও মৃত্যুর বিভীষিকা তাঁর অন্তরকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি কেবল একজন শিল্পী হিসেবে নয়, এক মানবিক চিন্তাবিদ ও সচেতন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সেই বাস্তবতাকে ধারণ করেন এবং তার শিল্পশক্তির মাধ্যমে জাতিকে একটি শক্তিশালী চাক্ষুষ ইতিহাস উপহার দেন।

কলকাতার রাজপথে খাদ্যের জন্য হাহাকাররত মানুষের ভিড়, অর্ধনগ্ন শিশুদের কঙ্কালসার শরীর, পথের ধারে মৃত্যু বরণ করা ক্ষুধার্ত মানুষের নিথর দেহ- এসবই তিনি তুলে ধরেন কালি ও কাগজের শক্তিশালী স্ট্রোকে। এই শিল্পকর্মগুলো পরবর্তীতে "ফ্যামিন ড্রইংস" বা "দুর্ভিক্ষ স্কেচ" নামে পরিচিতি পায়, যা শুধু বাংলার নয়, বিশ্বমানবতার ইতিহাসেও একটি দগদগে চিত্র হয়ে দাঁড়ায়।

জয়নুল আবেদিন তাঁর দুর্ভিক্ষ চিত্রে প্রথাগত সৌন্দর্যচর্চার ধারা থেকে সরে এসে বাস্তবতাকে নির্মম ও খাঁটি রূপে তুলে ধরেন। কালি ও রেখার ব্যবহারে তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের শীর্ণকায় দেহ, মুখাবয়বে জমাট বাঁধা যন্ত্রণা, হাড় জিরজিরে হাত-পা ও ক্লান্ত চোখের দৃষ্টিকে এমনভাবে অঙ্কন করেন, যা দর্শকের মন-মস্তিষ্ককে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। তাঁর এসব শিল্পকর্ম কেবলমাত্র সৃজনশীল প্রতিভার নিদর্শন নয়, বরং সেগুলো এক গভীর সামাজিক দায়বদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ- একটি জাতির সংকটকালীন ইতিহাসকে ধারণ ও সংরক্ষণের এক অনন্য উদাহরণ।

এই দুর্ভিক্ষচিত্রগুলো আজ বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে সংরক্ষিত রয়েছে, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বাঙালির সংগ্রামের ইতিহাস ও শিল্পের মানবিক দায়িত্ববোধের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ নিয়ে আকাঁ স্কেচ।

দুর্ভিক্ষের প্রভাব

অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়

পঞ্চাশের মন্বন্তরের ফলে বাংলার প্রায় ৭ লাখ পরিবার বা ৩৮ লাখ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। দুর্ভিক্ষ চলাকালে এই ব্যক্তিরা তাদের সব সম্পত্তি জমি, লাঙল, গবাদি পশু, গহনা, বাসন-কোসন, যন্ত্রপাতি- বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এর ফলে সাড়ে তিন লাখ পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে। বিশেষত কৃষকরা চরম ক্ষতির মুখে পড়ে; ৩০ লাখ কৃষক পরিবার ভূমি হারায়, এবং ৩৭ লাখ কৃষক পরিবারের জমির পরিমাণ দুই একরের বেশি ছিল না। দুর্ভিক্ষ পরবর্তী সময়ে ৩৪% কৃষক ভূমির মালিকানা ছাড়াই জমিতে চাষ করছিল।

পূর্ববঙ্গে জমি হস্তান্তর

১৯৪৩ সালের বাংলা দুর্ভিক্ষ, যা পঞ্চাশের মন্বন্তর নামেও পরিচিত, তার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছিল পূর্ববঙ্গে। এই দুর্ভিক্ষের ফলে অসংখ্য মানুষ জমি হারিয়েছিল। পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামে পরিচালিত এক তথ্য অনুযায়ী, ১৯৪৩ সালে ১৬৮টি পরিবারের মধ্যে ৫৪টি পরিবার তাদের জমির সম্পূর্ণ বা আংশিক অংশ বিক্রি করে দেয়। এর মধ্যে ৩৯টি পরিবার খাদ্যের অভাবের কারণেই জমি বিক্রি করেছিল। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, দুর্ভিক্ষ ছিল না শুধু খাদ্যের সংকট, বরং এর ফলে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষতি হয়েছিল। এ ধরনের ঘটনা গ্রামীণ অঞ্চলে দারিদ্র্য বৃদ্ধি ও সম্পদের অসম বণ্টনের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।[৬১] পূর্ববঙ্গে দরিদ্র কৃষকের সংখ্যা ছিল অধিক, ফলে তাঁদের মধ্যে অনেকেই জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় বাংলার ২৭টি জেলায় মোট ৩৫,৪০,২৫৫টি জমি হস্তান্তরের দলিল নথিভুক্ত হয়েছিল। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক, অর্থাৎ ১৮,৭১,৭৮৩টি দলিল ছিল পূর্ববঙ্গের সাতটি জেলা৩ ঢাকা, বরিশাল, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহে।[৬২] একটি দলিলে গড়ে তিন বিঘা বা এক একর জমি হস্তান্তর হয়েছে ধরে নিলে মোট ১৯ লাখ একর জমি এক বছরে হস্তান্তরিত হয়েছিল। এই সাতটি জেলায় মোট আবাদি জমির প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ জমি হস্তান্তরের নথি পাওয়া গিয়েছিল। নীলফামারী সাব-রেজিস্ট্রারি অফিসেই ১৯৪৩ সালের প্রথম নয় মাসে ১১,৯১৫টি জমি বিক্রির কাবলা রেজিস্ট্রি হয়েছিল।[৬৩] এই সব তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, দুর্ভিক্ষ ছিল না শুধু খাদ্যের অভাব, বরং এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির গভীর ক্ষতি হয়েছিল এবং অসমতা আরও বেড়েছিল।

স্বাস্থ্য সংকট ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে শুধুমাত্র খাদ্যের ঘাটতি হয়েছিল তা নয়, সেই সাথে এটি ছিল একটি মানবিক ও স্বাস্থ্য সংকট। খাদ্য ও পুষ্টির অভাব, দারিদ্র্য, গৃহহীনতা এবং খারাপ পরিবেশের কারণে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ রোগ-ব্যাধির শিকার হয়েছিল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর ছিল ম্যালেরিয়াজনিত মৃত্যু।

সে বছর প্রায় ৯ লাখ মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল। এদের মধ্যে ৩৬,০০০ জন ম্যালেরিয়ায় মারা যায়।[৬৪] ১৯৪৩ সালের অক্টোবর-নভেম্বর থেকে ১৯৪৪ সালের মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত ৫৮,২৩০ জন মৃত্যুবরণ করে।[৬৫]

এই সংখ্যাগুলো ঐতিহাসিক রেকর্ড থেকে পাওয়া গেছে এবং এগুলো দুর্ভিক্ষের সঙ্গে যুক্ত মহামারী স্বাস্থ্য সংকটের প্রতিফলন ঘটায়।

ম্যালেরিয়া ছড়ানোর অন্যতম কারণ ছিল দুর্ভিক্ষজনিত পরিবেশ-
বসতি ছাড়ার ফলে মানুষ অস্থায়ী ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিল। পানীয় জলের অভাব এবং জলাভূমির সঠিক পরিচালনা না হওয়ায় মশার বংশবৃদ্ধি বেড়েছিল। ক্ষুধা ও খারাপ পুষ্টি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছিল।[৬৬] এসব কারণে ম্যালেরিয়া দুর্ভিক্ষের সবচেয়ে বড় মৃত্যুর কারণগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।

কৃষিকাজ ব্যাহত ও গবাদি পশুর সংকট

১৯৪৩ সালের বাংলা দুর্ভিক্ষের সময় গবাদি পশুর হ্রাস ছিল কৃষি উৎপাদন কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ। খাদ্যের ঘাটতি ও অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে পড়ে অসংখ্য কৃষক তাদের গরু-মহিষ বিক্রি করে দিয়েছিল। ফলে কৃষিকাজ ব্যাহত হয়েছিল, জমি অনাবাদি থেকে যায় এবং খাদ্য উৎপাদন আরও কমে যায়।

এই সময় বাংলায় প্রায় ৩০ লাখ ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন ছিল। তাদের খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য প্রচুর গবাদি পশু জবাই করা হয়েছিল। এর ফলে গবাদি পশুর সংখ্যা দ্রুত কমে যায়।[৬৭] এই সংকট কৃষি উৎপাদনকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল, কারণ ছিল গরু-মহিষ ছিল কৃষি কাজের প্রধান শক্তি। পশু ছাড়া জমি চাষযোগ্য হয়ে ওঠে না। পশুর গোবর সার হিসেবে ব্যবহৃত হতো, যা কৃষি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সব কারণে ১৯৪৩ সালে অনেক জমি অনাবাদি থেকে যায়, যা দুর্ভিক্ষের তীব্রতা আরও বাড়িয়েছিল।

কৃষক আন্দোলন ও তেভাগা আন্দোলনের বিস্তার

১৯৪৩ সালের বাংলা দুর্ভিক্ষের পর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্থিতিশীলতা দারুণভাবে বেড়ে যায়। খাদ্যের ঘাটতি, জমি হারানো, গবাদি পশুর সংকট এবং কৃষি উৎপাদনের অবসান দুর্ভিক্ষজনিত ক্ষোভকে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ দেয়। ফলে ১৯৪৬ সালের দিকে বাংলাজুড়ে শুরু হয় তেভাগা আন্দোলন , যা ছিল একটি ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন।

তেভাগা আন্দোলনের মূল দাবি ছিল- জমিদারদের কাছ থেকে চাষীদের ফসলের অর্ধেকের বদলে এক-তৃতীয়াংশ (এক ভাগ) ভাড়া দিয়ে বাকি দুই-তৃতীয়াংশ নিজেদের রাখার অধিকার। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, ভাগচাষী কৃষক,মহিলা ও পুরুষ উভয়ে। এ ছাড়া হিন্দু, মুসলমান ও আদিবাসী সম্প্রদায়। আন্দোলনটি বাংলার যেসব অঞ্চল দুর্ভিক্ষে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেখানে এটি ব্যাপক সাড়া জাগায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অঞ্চলগুলো হল: উত্তরবঙ্গ : দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি; পূর্ববঙ্গ : ময়মনসিংহ; পশ্চিমবঙ্গ : মেদিনীপুর, যশোহর জেলা।এছাড়াও বিভিন্ন অন্যান্য অঞ্চলে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে মোটামুটি ৬০ লাখ ভাগচাষী এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এটি ছিল না শুধু অর্থনৈতিক দাবির আন্দোলন, বরং এক জনগণের সংগ্রামের প্রতীক।

ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ভারতবাসীকে উপলব্ধি করায় যে এর মূল কারণ ছিল ঔপনিবেশিক অপশাসন। এর ফলে উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতজুড়ে আন্দোলন শুরু হয়। ব্রিটিশ সরকারও বুঝতে পারে যে উপনিবেশিক শাসন দীর্ঘদিন চালানো সম্ভব নয়, এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দ্রুত ভারতকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়।

উপসংহার

১৯৪৩ সালের বাংলা দুর্ভিক্ষ ছিল মানবিক ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়। এই দুর্ভিক্ষে প্রায় ৩৫ লাখ মানুষ ক্ষুধার্ত ও নিরীহভাবে প্রাণ হারায়। এটি ছিল না কেবল খাদ্যের ঘাটতি, বরং ঔপনিবেশিক শাসনের নির্মম শোষণ ও মানবিক মূল্যবোধহীনতার প্রতীক।

দুর্ভিক্ষের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছিল গ্রামাঞ্চলে, যা ছিল এর মূল শিকার। কলকাতার রাস্তায় যেসব মানুষ ক্ষুধায় মারা গিয়েছিল, তারা শহরের বাসিন্দা ছিল না- তারা ছিল গ্রাম থেকে আসা অসহায় কৃষক, ভাগচাষী ও দরিদ্র মানুষ, যারা খাদ্যের খোঁজে শহরে এসে মৃত্যুকে বরণ করেছিল। এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, গ্রামীণ জনগণই ছিল দুর্ভিক্ষের সবচেয়ে বড় শিকার। এই মহামারী মানবিক সংকট ছিল ব্রিটিশ শাসনের স্বার্থান্ধ নীতির ফসল। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ছিল ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের নির্মম দৃষ্টান্ত। যেখানে শাসকরা নিজেদের স্বার্থে উপমহাদেশের সম্পদ ব্যবহার করেছে, অথচ এ দেশের মানুষের জীবনকে তুচ্ছ মনে করেছে। দুর্ভিক্ষ চলাকালে মানুষের মৃত্যুর প্রতি ঔপনিবেশিক প্রশাসনের উদাসীনতা এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় তাদের অবহেলা ও প্রশাসনিক উদাসীনতা এই শোষণমূলক শাসনব্যবস্থার অন্তর্নিহিত নিষ্ঠুরতাকে তুলে ধরে। এর প্রেক্ষিতে, বিশ্বযুদ্ধের পর উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে, যা শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শক্তির পতন ঘটায়।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ যাজ্ঞসেনী চক্রবর্তী, "বাংলায় ৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, মানবাধিকারের ইতিহাসে কালো দাগ" *বঙ্গদর্শন*, ১০ ডিসেম্বর ২০২১। https://www.bongodorshon.com/home/story_detail/bengal-famine-of-1943-britains-worst-human-rights-violation-on-indian-soil

২ জনম মুখোপাধ্যায়, *ক্ষুর্ধাত বাংলা: যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা এবং সাম্রাজ্যের সমাপ্তি* (Bengali Translation of Hungry Benal: War, Famine, Riots and the End of Empire) (কোলকাতাঃ গাঙচিল, ২০২০), পৃ. ৮৫।

৩ Tarakchandra Das. Bengal Famine (1943), As revealed in a Sirveu pf the Destitutes in Calcutta (Calcutta: University of Calcutta, 1949), p. 1.
তারক দাশের লেখার বাংলা অংশ গৃহীত হয়েছে, অভিজিত গুহ, "বাংলার মহাদুর্ভিক্ষের নৃতাত্ত্বিক গবেষণা" আরেক রকম, সপ্তম বর্ষ, দশম সংখ্যা, ১৬-৩১ মে ২০১৯। গুরুত্ব বিবেচনা করে মূল ইংরেজী লেখাটি প্রদান করা হলো।
With the end of January 1943, the rice-market began to show unusual symptoms of unrest. This was the time when the cultivators had their granaries full, when few people came to the market to purchase food-grains. Yet the market began to experience steady rise---at first show but gradually it gathered momentum and at last, by the end of May, it jumped to a figure which was four to six hundred per cent more than the usual price of rice in previous years, at that period the year. In Chittagong the increase was eight hundred per cent. …
This reserve ws soon eaten up by the soaring price of rice. At first the ornaments were sold or mortgaged, then came the domestic animals and domestic utensils. Next those parts of their poor cottages which had a market, were sold out. These consisted of doors and dindow-sills and panels, and corrugated iron-sheets. Last of all the implements of occupation were paarted with. When everything was lost, the helpless people began to live upon wild roots, fruits, and leaves. The stems and tubers of wild Colocasia antiquorum, were extensively consumed. The aquatic plants like shapla (Nymphaea lotus) were eaten in large quantity. Molluscs from ponds were boiled in water and eaten with avidity. We found heaps of shells of snails in front of almost every house in a number of villages in the District of Howrah. When even these wild products of their habital became rare they began to move towards the nearest towns. By that time many of them had lost their health and strength. Lack of food had already undermined their vitality: consumption of unwholesome food had upset their digestion, and, and, as a result, most of them fell easy prey to bowel complaints. This was mostly the case with adult men and women for they had tried their utmost to save the children from the ravages of hunger. But their sacrifice was of no avail. (pp. 1-2.)

৪ *পূর্বোক্ত*।

৫ *পূর্বোক্ত*।

৬ উদ্ধৃত হয়েছে, মধুশ্রী মুখোপাধ্যায়, *পঞ্চাশের মন্বন্তরে চার্চিলের ষড়যন্ত্র* (ঢাকা: সেতু প্রকাশনী, প্রকাশনা কাল, উল্লেখ নেই), পৃ. ১৯৯।

৭ "দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৩" *বাংলাপিডিয়া*। https://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7,_%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%AA%E0%A7%A9

৮ Amartya Sen, "Ingredients of Famine Analysis: Availability and Entitlements" *The Quarterly Journal of Economics*, Aug., 1981. Vol. 96. No.3 (Aug., 1981), p. 441.

৯ Amartya Sen, "Ingredients of Famine Analysis: Availability and Entitlements" *The Quarterly Journal of Economics*, Aug., 1981. Vol. 96. No.3 (Aug., 1981), p. 441.

১০ Paul R.Greenough, *Prosperity and Misery in Modern Bengal: The Famine of 1943-1944* (New York and Oxford: Oxford University Press, 1982), p.

১১ Amartya Sen, "Ingredients of Famine Analysis" *Op cit*.

১২ *Ibid*.

১৩ Famine Inquiry commission *Final Report, Famine Inquiry Commission* (John Woodhead, Chairman), India, 1945, pp. 105-06.

১৪ Amarta Sen, p. 52.

১৫ "১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কারণ।" *Lighteducationbd*. https://lighteducationbd.com/%e0%a7%a7%e0%a7%af%e0%a7%aa%e0%a7%a9-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95/

১৬ এম. ওয়াজেদ আলী, *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০), পৃ. ১১৩-১৪।

১৭ জনম মুখোপাধ্যায়, *ক্ষুধার্ত বাংলা: যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা এবং সাম্রাজ্যের সমাপ্তি* (Bengali Translation of Hungry Benal: War, Famine, Riots and the End of Empire) (কোলকাতা: গাঙচিল, ২০২০), পৃ. ৮৫-১০০।

১৮ Tirthankar Roy, "Famines in Late Nineteenth and Early Twentieth Century India: The Role of State Intervention", *Indian Economic and Social History Review,* 35, no. 2 (1998): 142-143.

১৯ Amartya Sen, Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation (Oxford: Oxford University Press, 1981), 110-112.

২০ Biswamoy Pati, "The Bengal Famine of 1943: A Reappraisal", *Proceedings of the Indian History Congress*, vol. 54 (1993), 425.

২১ জনম মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*।

২২ "১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কারণ।" *LIGHTEDUCATIONBD* in https://lighteducationbd.com/%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%AA%E0%A7%A9-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0 %A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95/

২৩ *পূর্বোক্ত*।

২৪ B.M. Bhatia, *Famine in India: A Study in Some Aspects of the Economic History of India, 1860-1945* (New Delhi: Asia Publishing House, 1963), p. 309.

২৫ *পূর্বোক্ত*।

২৬ মধুশ্রী মুখোপাধ্যায়, *পঞ্চাশের মন্বন্তরে চার্চিলের ষড়যন্ত্র* (কোলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স ২০১৭), পৃ. ১৯৯।

২৭ *পূর্বোক্ত*।

২৮ *পূর্বোক্ত*।

২৯ *The Amrita Bazar Patrika*, April 3, 1942.

৩০ Paul R. Greenough, ÓIndian Famines and Peasant Victims: the Case of Bengal in 1943-44Ó, *Modern Asian Studies*, 1980, Vol. 14, No. 2 (1980), pp. 205-235 Published by: Cambridge University Press Stable, p. 207. URL: https://www.jstor.org/stable/312413.

৩১ কবীর, মীর হুমায়ুন, "নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: প্রসঙ্গ দুর্ভিক্ষ" *রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা* (১৪২৮), ৪। পৃ. ১৫।

৩২ *পূর্বোক্ত*।

৩৩ Paul Greenough, 209.

৩৪ অমলেন্দু সেনগুপ্ত, *উত্তাল চল্লিশ: অসমাপ্ত বিপ্লব* (কলিকাতা: পার্ল পাবলিকেশন, ১৯৯৭), পৃ. ১৫।

৩৫ শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২), পৃ. ১৮।

৩৬ ইওগিতা লিমাই, "বেঙ্গলে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের জন্য কতোটা দায়ী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল?" *বিবিসি নিউজ বাংলা*, https://www.bbc.com/bengali/news-53491284

৩৭ উদ্‌ধৃত হয়েছে, মীর হুমায়ুন কবীর, "নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: প্রসঙ্গ দুর্ভিক্ষ" *রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা: ৪।। শরৎ ১৪২৮, পৃ. ১৫।

৩৮ Paul Greenough, *প্রাগুক্ত*।

৩৯ *Famine Inquiry Commission, Report on Bengal* (New Delhi: Manager of Publication, 1945), Appendix 2, Statement 1, p. 213.

৪০ *Bengal Legislative Assembly Proceedings*, 64:3, March 15, 1943, pp. 212-13; 65:1, July 12, 1943, pp.251-53; 66:2, September 22, 1943, pp. 116-18.

৪১ *পূর্বোক্ত*।

৪২ Srinath Raghavan. *India's War: The Second World War and the Making of Modern South Asia* (New Delhi: HarperCollins, 2016), pp. 224–225.

৪৩ Amartya Sen, *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation* (Oxford: Oxford University Press, 1981), 115–116.

৪৪ Sugata Bose, 'Starvation amidst Plenty: The Making of Famine in Bengal, Honan and Tonkin, 1942-45' *Modern Asian Studies*, Oct., 1990, Vol. 24. (Oct.1990) p. 717.

৪৫ *Statesman*, 23 September 1943.

৪৬ Paul Greenough, p. 208.

৪৭ Paul R. Greenough, 'Indian Famines and Peasant Victims: the Case of Bengal in 1943-44'. *Modern Asian Studies*, 1980, Vol. 14, No. 2 (1980), pp. 205-235, p. 208.

৪৮ শেখ মুজিবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, ১৮।

৪৯ Letter to Winston Churchill, dated 24 October 1944; quoted in Amarta Sen, Poverty and Famines, An Essay on Entitlement and Deprivation, (Oxford: Clarendon Press, 1981), p. 79.

৫০ Madhusree Mukerjee, *Churchill's Sectet War: The British Empire and the Ravaging of India during World War II* (New York: Basic Books, 2011), p. 129.

৫১ যাজ্ঞসেনী চক্রবর্তী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯।

৫২ Madhusree Mukerjee, *Churchill's Sectet War: The British Empire and the Ravaging of India during World War II* (New York: Basic Books, 2011), p. 151.

৫৩ মধুশ্রী মুখোপাধ্যায়, *পঞ্চাশের মন্বন্তরে চার্চিলের ষড়যন্ত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৪।

৫৪ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯১।

৫৫ Shashi Tharoor, *Inglorious Empire, What the British Did to India* (London: Scribe Publications, 2016), p. 167.

৫৬ Rakhi Chakraborty, *প্রাগুক্ত*, 'The Bengal Famine: how the British Engineered the Worst Genocide in Human History for Profit' https://yourstory.com/2014/08/bengal-famine-genocide

৫৭ "বাংলার ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের বড় কারণ ব্রিটিশ সরকারের নীতি" *বাংলা ট্রিবিউন*, ৩০ মার্চ ২০১৯।

৫৮ মধুশ্রী, পৃ. ২০১-২২৬।

৫৯ *পূর্বোক্ত*।

৬০ মঙ্গলাচরণ, 'ভ্রমণ', মেঘ, বৃষ্টি ঝড়, https://www.youtube.com/shorts/9f5mASTPOo0

৬১ Cormac Ó Gráda, *Famine: A Short History* (Princeton: Princeton University Press, 2009), 125–126.

৬২ Tirthankar Roy, 'Famines in Late Nineteenth and Early Twentieth Century India: The Role of State Intervention', *Indian Economic and Social History Review* 35, no. 2 (1998): pp. 146.

৬৩ Ibid.

৬৪ B. M. Bhatia, *Famine in India* (Delhi: Mittal Publications, 1985), p. 179.

৬৫ Mallik, Senjuti, 'Colonial Biopolitics and the great Bengal famine of 1943.' Geo Journal 88, no. 3 (2023): 3205-3221.

৬৬ Paul R. Greenough, *Prosperity and Misery in Modern Bengal: The Famine of 1943–1944* (New York: Oxford University Press, 1982), 107.

৬৭ B. M. Bhatia, pp. 176–177.